পিপিপি'র নামে রাষ্ট্রের সম্পদ ব্যক্তির হাতে তুলে দেওয়ার বিরুদ্ধে রুখে দাড়াও!

পাটকল বন্ধ এবং শ্রমিকদের চাকরির অবসায়ন, সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে সম্ভাবনাময় এই রাষ্ট্রীয় খাতটির কফিনে সর্বশেষ পেরেকঃ সরকার কর্তৃক কভিড-১৯ মহামারি সৃষ্ট স্থবিরতাকে সুযোগ হিসেবে ব্যবহার

পাট চাষ ও পাট শিল্প বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির অংশ। পাট দেশের প্রধান অর্থকারী ফসল। আঁশ জাতীয় কৃষি ফসলের মধ্যে বিশ্বে তুলার পরই পাটের স্থান। দেশে প্রায় ৪০ লাখ কৃষক পাট চাষের সাথে যুক্ত। পাটচাষ, প্রক্রিয়া করণ, পাট ও পাট জাতীয় বিভিন্ন উপকরণ তৈরী ও বানিজ্যের সাথে প্রায় ৪ কোটি মানুয়ের জীবন জীবিকা জড়িত। বাংলাদেশের অর্থকরী ফসলের মধ্যে একমাত্র পাট খাতই শতভাগ মূল্য সংযোজনকারী, পশ্চাৎ ও সম্মুখ সংযোগ শিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ। ঐতিহাসিকভাবে পাটের অর্থনীতি আমাদের গোটা অর্থনীতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। সেই পাট এবং পাটশিল্প ধ্বংস হওয়া অর্থ বাংলাদেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির উপর আঘাত হিসেবে বিবেচনা যোগ্য।

গত ২৮ জুন গণমাধ্যমে এক আকস্মিক ঘোষণা দিয়ে সরকার রাষ্ট্রায়ত্বখাতের অবশিষ্ট ২৫টি পাটকল বন্ধ এবং এই মিলগুলোতে কর্মরত প্রায় ৪৫ হাজার স্থায়ী ও বদলি শ্রমিকদের অবসায়ন ঘটিয়েছে। বিভিন্ন সূত্রের বরাতে, বিগত এক বছর ধরে অত্যন্ত গোপনে সরকারের আমলারা শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে পাটকল বন্ধ করা ও কথিত পিপিপি'র আয়োজনে ব্যক্তিমালিকানায় ছেড়ে দেয়ার জন্য কারখানাসহ এর বিপুল সম্পদ লুটেরাদের কাছে হস্তান্তর করার প্রস্তাব অনুমোদন করিয়ে নিয়েছে। সরকার লুটপাটের দুর্নীতিকে আড়াল করে লোকসানী প্রতিষ্ঠান হিসেবে পাটকলকে চিহ্নিত করে এর দায় শ্রমিকদের উপর চাপিয়ে এর সমাপ্তি টানতে চাইছেন। এটা 'উদোর পিন্ডি বুদোর ঘাড়ে' চাপানোর কৌশল মাত্র যা সরকারের বিরাষ্ট্রীয়করণনীতি কৌশলের এবং নয়া-উদারিকরণ পুঁজিবাদীনীতি বাস্তবায়নের অংশ বলে আমারা মনে করি। পাটকল পরিচালনা করেন, বিজেএমসির কর্তাব্যক্তিরা। বিজিএমসির কর্তাব্যক্তিদের পরিচালনা করেন মন্ত্রী-সচিব। তাহলে পাটকলগুলি যদি হাজার হাজার কোটি টাকা লোকসান গুনে থাকে, তার দায় কেবল শ্রমিকেরা কেন নেবেন? কেন মন্ত্রী-সচিব-চেয়ারম্যানরা নেবেন না? কেন শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার আগে কারখানার ব্যবস্থাপক তথা বিজেএমসির পদাধিকারীদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়া হবে না?

সরকারের এই ঘোষণা পাটশিল্প ধ্বংস করার আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত। আশাকরি এই আত্মঘাতী সিদ্ধান্ত থেকে সরকার সরে আসবে। পাটকল বন্ধের সাথে পাটকলের আধুনিকায়নের জন্য পিপিপি-তে নিয়ে তা চালু করার সিদ্ধান্ত ঘোষিত হলেও কবে নাগাদ ও কিসের ভিত্তিতে এসকল পাটকল পিপিপি-তে চালু করার হবে তার কোন সময়সীমা বেঁধে দেয়া হয়নি। ইতিমধ্যে পাটখাতের ব্যক্তিমালিকরা পিপিপি'র প্রস্তাব খারিজ করে দিয়ে বন্ধকৃত পাটকলসমূহ তাদের নিরানব্বই বছরের ইজারা দেয়ার দাবি জানিয়েছে।

পাট সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীদারদের সাথে কোন আলোচনা বা মতামত গ্রহনেরও কোন সুযোগ দেওয়া হয়নি। যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীত অবস্থান এবং এটা গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। অন্যদিকে বিষয়টি এমন এক সময় করা হলো যখন বিশ্বে এক ভয়াবহ মহামারি কভিড-১৯ এ আক্রান্ত। আমাদের দেশও এই মহামারির কবলে পুরোপুরি স্থবির। মুলত এই সুযোগটি তারা কাজে লাগিয়েছে। জনগণের জীবন-জীবিকা পর্যুদস্ত। দেশে প্রায় দেড়কোটি মানুষ তাদের কর্মসংস্থান হারিয়ে এখন বেকার। এখন পাটকল শ্রমিকেরা সেই বেকারের তালিকায় যুক্ত হলেন। বর্তমান প্রেক্ষাপটে পাটকল বন্ধ করে কথিত গোল্ডেন হ্যান্ডসেক দিয়ে শ্রমিকদের অবসায়ন করা হচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর ২৫ হাজারের মতো শ্রমিক কাজ হারালেও তাদের উপর নির্ভরশীল কয়েক লাখ মানুষকে সরকারের সিদ্ধান্তে ভুগতে হবে। দেশে যখন মহামারি অর্থনীতি বিপর্যয়ের মুখে তখন পাটকলের শ্রমিকদের হাতে

কিছু অর্থ ধরিয়ে দিয়ে সারা জীবনের পেশা পরিবর্তনের জন্য বাধ্য করা সম্পূর্ণ অন্যায় ও অমানবিক এবং মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও সংবিধানের মূলনীতির পরিপন্থি।

দেশের জিডিপিতে পাট খাতের অবদান ০.২৬ শতাংশ এবং কৃষি জিডিপিতে তা ১.৪ শতাংশ। কিন্তু ভরা মৌসুমে একসঙ্গে এত পাটকল বন্ধ হওয়ায় ফসলের দাম পাওয়া নিয়ে শঙ্কায় রয়েছেন পাটচাষিরা। দেশে বর্তমানে সাড়ে সাত থেকে আট লাখ হেক্টর জমিতে পাট চাষ হয়, এর থেকে কম বেশি ৮০ লাখ বেল পাটের আঁশ উৎপন্ন হয়ে থাকে। এবার কৃষক বেশি জমিতে পাট চাষ করেছেন। বতর্মানে বাজারে প্রতি মণ পাট ১৮০০ টাকা থেকে ১৯০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতবার বিক্রি হয়েছিল ২২০০ টাকা পর্যন্ত। দাম কমায় ক্ষোভ প্রকাশ করে পাটচাষিরা। প্রতি মণ পাট উৎপাদনেই দেড় হাজার টাকার বেশি খরচ হয়। গত কয়েক বছর ধানের দাম না থাকায় এবং পাটের দাম বেশি পাওয়ায় কৃষকেরা ক্রমশ ঝুঁকছিলেন পাটের দিকে। আশঙ্কার কথা হ'ল, এবার দাম না পেয়ে চাষিরা পাট চাষে আগ্রহ হারালে উৎপাদন কমে যাবে। তাতে সঙ্কটে পড়বে বেসরকারি পাটকলগুলোও।

সরকারি হিসাবে পাটচাষির সংখ্যা ৪০ লাখ হলেও দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় ২০ শতাংশ পাট চাষ এবং চাষ পরবর্তী বিভিন্ন প্রক্রিয়া যেমন- প্রক্রিয়াজাতকরণ, আঁশ বাঁধাই, গুদামজাতকরণ, পরিবহন/স্থানান্তর ও বিপণন ইত্যাদিতে জড়িত। আঁশ ছাড়ানোর পর পাওয়া পাটকাঠি গ্রামে জ্বালানির প্রধান উৎস; পাটচাষ কমে গেলে পাটকাঠি না পেয়ে বৃক্ষ নিধনের প্রবণতা বাড়তে পারে, যা পরিবেশের জন্য বড় হুমকি হয়ে দেখা দিতে পারে। মৌসুমের ঠিক আগে আকস্মিক পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের নেতিবাচক প্রভাব পড়বে পুরো কৃষিতে। দেশে এখন বেশ কিছু ব্যক্তি মালিকানার পাটকল আছে। তারা মিলের জন্য পাট খরিদ করবে, কিন্তু দাম দেবে না। করোনাভাইরাস দুর্যোগের এই সময়ে শ্রমিক ছাঁটাইয়ের ঘোষণা বেসরকারি মালিকদের শুধু উৎসাহিত করবে তাই নয়, তাদেরকে বেপরোয়া করে তুলবে।

পাটের চাষাবাদ পরিবেশ রক্ষার বিকল্প পথও। পাটখাত উন্নয়নের জন্য এ খাতে সরকারের বিনিয়োগ প্রয়োজন। চাষ করার মাত্র ১০০ থেকে ১২০ দিনের মধ্যে পাটের আশ পাওয়া যায়। গবেষনায় দেখা গেছে প্রতি হেক্টর পাটের ফসল বাতাস থেকে প্রায় ১৪.৬৬ টন কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করতে সক্ষম হয়। যার জন্য বলা যায় পাট ফসল বায়ুমন্ডলের দূষিত কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে বায়ুমন্ডলকে পরিশোধিত করে। ফলে পাট ফসল পৃথিবীর গ্রিন হাউস গ্যাস ও তার পরিপ্রেক্ষিতে তাপমাত্রা বৃদ্ধিকে কিছুটা হলেও ব্যাহত করে পৃথিবীকে তার পরিবেশ রক্ষায় সহায়তা করে। অন্য দিকে, প্রতি হেক্টর পাট ফসল ১০০ দিন সময়ে ১০.৬৬ টন অক্সিজেন ত্যাগ করে বায়ুমন্ডলকে শুদ্ধ করে। এ মাত্রায় বাংলাদেশের চাষকৃত পাট ফসল তার মোট চাষ এলাকার বায়ুমন্ডল থেকে প্রতি বছর ১০০ দিনে প্রায় ৮১১৫.১৯ হাজার টন কার্বন-ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং প্রায় ৫৯০০.৯৫ হাজার টন অক্সিজেন প্রদান করে। প্রাকৃতিক ভারসাম্য রক্ষায় এ অবদানের জন্য এই জন্য বাজেট বরাদ্ধ রাখতে হবে।।

অন্য আরেকটি সমীক্ষায় দেখা গেছে, পাট ফসল উৎপাদন কালে হেক্টরপ্রতি ৫ থেকে ৬ টন পাটপাতা মাটিতে পড়ে। এছাড়াও পাট ফসল কর্তনের পর জমিতে যে পাট গাছের গোড়াসহ শিকড় থেকে যায় তা পরবর্তীতে পচে মাটির সাথে মিশে সার তৈরি করে, এতে পরবর্তী ফসল উৎপাদনের সারের খরচ কম লাগে। পাতা পড়া এবং গোড়াসহ শিকড় থেকে যে পরিমাণ সার হয়, তার খাদ্য উৎপাদন মূল্যায়নে দেখা গেছে তা প্রায় ইউরিয়া ২৫১৭৪ টন, টিএসপি ৩৭৩৩ টন, এমপি ২৭৩৩ টন, জিপসাম ৩৮০৮০ টন এবং ডোলমাইট ৩০৫৪৫ টনের সমমানের। এছাড়া মাইক্রো খাদ্য উপাদান যেমন- ফেরাস সালফেট ৩৬০ টন, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট ১৬০ টন ও জিংক সালফেট ৩৩ টনের সমমান পাওয়া যায়। গবেষণায় দেখা গেছে পাট পচানোর সময় যে গ্যাস উৎপন্ন হয় তাতে ৫০% থেকে ৬০% মিথেন থাকে যা থেকে বসতবাড়িতে বা শিল্প কারখানায় ব্যবহার উপযোগী জ্বালানি গ্যাস তৈরি করা যেতে পারে। পাট পচনশীল এবং পাট থেকে কোনো বিষাক্ত গ্যাস নির্গত হয় না।

বাংলাদেশের সূচনা লগ্নে প্রধান রপ্তানি পণ্য পাটকে বলা হত সোনালী আঁশ। দেশে উৎপাদিত পাটের আঁশের প্রায় ৫১ শতাংশ পাটকলগুলোয় ব্যবহৃত হতো, ৪৪ শতাংশের মতো কাঁচা পাট বিদেশে রপ্তানি হয় এবং মাত্র ৫ শতাংশের মতো লাগে ঘর-গৃহস্থালি আর কুটিরশিল্পের কাজে।

আজ নতুন করে পাটের অর্থনীতি অনেকটা চাঙ্গা হওয়ার দিকে। পাটের উৎপাদন আগের তুলনায় বেড়েছে। বাংলাদেশে ৯০ এর দশকে পাট হতো ১২ লাখ হেক্টর জমিতে। মাঝে তা ৪.০-৪.৫ লাখ হেক্টরে নেমে যায়। কিন্তু প্রাকৃতিক আঁশের চাহিদা ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধির কারণে ২০১০-১৫ সাল নাগাদ চাষের এলাকা বেড়ে ৭ লাখ হেক্টরে পৌঁছায়। আগে ১২ লাখ হেক্টর এলাকা থেকে যে পরিমাণ পাট পাওয়া যেত, উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের কারণে এখন ৭-৮ লাখ হেক্টর জমি থেকেই তার চেয়ে বেশি পাওয়া যাচ্ছে। পাটের আভ্যন্তরীন ব্যবহারও বেড়েছে। অভ্যন্তরীন বাজারে পাটের ব্যগের চাহিদা ১০ কোটি থেকে ৭০ কোটিতে উন্নিত হয়েছে। শুধু রপ্তানি নয় দেশের অভ্যন্তরে পাটও পাটজাত পন্যের যে বিশাল বাজার রয়েছে। বিশ্ববাজারে পাট জাত পণ্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে বাংলাদেশ প্রায় ৭হাজার ৭শত কোটি টাকার পাট এবং পাটজাত পণ্য রপ্তানি করেছে। রপ্তানির পরিমান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিজেএমসি এর পরিচালনাধীন কারখানা গুলিতে লোকশানের পরিমান বাড়ছে বিপরীতে বেসরকারি মালিকানায় নতুন নতুন পাটকল গড়ে উঠছে। পরিবেশ বান্ধব পাট পণ্য বহমুখী করার পদক্ষেপ নেয়ার কারনে পাটজাত পন্যের সংখ্যা ২৪০ এ দাড়িয়েছে। পাটের বহুমুখী ব্যবহার এবং উন্নত চাষাবাদের জন্য আমাদের দেশের বিজ্ঞানীরা কাজ করেছেন। তারা ৩৮টি উচ্চফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবন করেছেন।

পাঁচ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে শ্রমিকদের অবসায়ন, অথবা ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে বি.এম.আরই এর মাধ্যমে আধুনিকীকরণ এবং আমলাদের পরিকল্পনায় পাটকল বন্ধ করার প্রস্তাবনা পাটশিল্পের সংকট সমাধান করবে না। এর বিপরীতে প্রদত্ত মৌলিক সংস্কার প্রস্তাব উন্নত ও স্বয়ংক্রিয় প্রযুক্তি, তাঁত, ভিম এবং ওয়ার্প ওয়েল্ডিং ক্রয়ে মাত্র ১ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ এর মাধ্যমে উৎপাদন ক্ষমতা তিনগুন বৃদ্ধি করা সম্ভব।

ব্রিটিশ শাসনামলে বাংলায় আর পাকিস্থান পর্বে পাট শিল্পই ছিল একক বৃহত্তম শিল্প। ১৯৫২ সালে নারায়নগঞ্জের ডেমরায় বাওয়া জুট মিল স্থাপনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলায় পাট শিল্পের যাত্রা শুরু হয়। পাট চাষের উপযোগী আবহাওয়ার কারণে সহজলভ্য ও উন্নতমানের পাটের যোগান লাভজনক এই শিল্পের দ্রুত বিকাশ ঘটিয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তী সময় পাটকলগুলোকে জনগনের মালিকানায় নিয়ে ১৭২ সালে ৭৭টি পাটকল জাতীয়করণ করা হয়। এর মধ্যে এখন ২৫টি টিকে আছে।

কিন্তু পুরো পাটের অর্থনীতিকে সাম্রাজ্যবাদী দাতা গোষ্ঠি, বিশ্ব ব্যাংক ও আইএমএফ এর কুপরামর্শে এবং আমলা নির্ভর ব্যবস্থাপনায় আশির দশকে জেনারেল জিয়াউর রহমানের সময় থেকেই পাটশিল্পকে ধ্বংশের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে বেসরকারিকরনের নামে ব্যক্তি মালিকানায় ছেড়ে দেয়ার প্রক্রিয়া শুরু করার মাধ্যমে। পরে জেনারেল এরশাদের আমলে পঁয়ত্রিশটি পাটকলকে বেসরকারি খাতে ছেড়ে দেয়া হয় এবং সরকার পুঁজি প্রত্যাহার করে নেয় আরও আটটি পাটকল থেকে। ১৯৯০ সালের পর বিশ্ব ব্যাংকের পাট খাত সংস্কার কর্মসূচির আওতায় ১১টি পাটকল বন্ধ, বিক্রি ও একীভূত করা হয়। এরপরে বিএনপি সরকারের সময়ে ২০০২ সালের জুনে বন্ধ হয় দেশের বৃহত্তম আদমজী জুট মিল। শেষ পর্যন্ত যে ২৫টি কোনো রকমে চলছিলো সেগুলোও বন্ধ করে দিলো বর্তমান সরকার।

রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকল বন্ধ হওয়ার কারনে শুধুমাত্র ২৫ হাজার পাটকল শ্রমিকরাই ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার পাশাপাশি ৪০ লাখ পাটচাষী ও পাট চাষের সাথে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুক্ত ৪ কোটি মানুষও ক্ষতিগ্রস্থ হবে। ক্ষতিগ্রস্থ হবে দেশের জাতীয় অর্থনীতি। জিম্মি হয়ে পড়বে বেসরকারি খাতের মিলগুলোর কাছে। বাংলাদেশের পাটজাত দ্রব্য যে

আন্তর্জাতিক বাজার হারাবে তা সহজে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হবে না এবং পাটকলের জন্য যে অভিজ্ঞ শ্রমিক গড়ে উঠেছিল তারাও হারিয়ে যাবে। পাট বাংলাদেশের একটি স্থায়ী শিল্পের ভিত্তি রচনা করেছিল, যার কাঁচামাল দেশে উৎপাদিত হয়। দেশের চাহিদা পূরণ করে যা রপ্তানি করে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। সেই শিল্প ও শ্রমিক-কৃষকের স্বার্থে সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রয়াত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার এবং কথিত গোল্ডেন হ্যান্ডশেক এর মাধ্যমে শ্রমিক ছাটাইয়ের সিদ্ধান্ত এখনই বন্ধ করে রাষ্ট্রায়াত্ব খাতে পাটকল সমূহ বহাল এবং তার সংস্কার ও আধুনিকায়ন করা উচিত।

পাট ও পাটশিল্প রক্ষা ও টেকসই করতে কতিপয় সুনির্দিষ্ট সুপারিশ ও প্রস্তাব:

১। পাট উৎপাদন বৃদ্ধি করার লক্ষে পাট চাষিদের উন্নত মানের বীজ সরবরাহ করা। ভালো জাতের পাট উৎপাদনে প্রণোদনা দেয়া। পাট চাষের এলাকা বৃদ্ধি এবং প্রয়োজনীয় ভর্তুকি দিয়ে পাটের আবাদ বৃদ্ধি করতে হবে।

২। পাটখাতে ভর্তুকি দেয়া হলো প্রাথমিক বিনিয়োগ। বাংলাদেশের ব্রান্ডকে টিকিয়ে রাখতে অবশ্যই সরকারকে পাটখাতে বিনিয়োগ করতে হবে। এই বিনিয়োগে বহুমুখী প্রভাব তৈরী হবে। এই বিনিয়োগ দ্বারা পাটকলগুলোয় সর্বশেষ আধুনিক প্রযুক্তি সংযোজন হলে উন্নত কারখানায় পরিনত ও সচল হবে। পাটচাষিরা ন্যায্যমূল্য পাবে। ব্যাকোয়ার্ড লিংকেজ শিল্পও রক্ষা পাবে।

৩। উৎপাদনশীলতা বাড়াতে দ্রুত শতবর্ষ পূরনো যন্ত্রপাতি সরিয়ে আধুনিক ও সর্বশেষ প্রযুক্তি সম্বলিত মেশিন প্রতিস্থাপন করতে হবে।

৪। দুর্নীতিমুক্ত পাট প্রশাসন প্রতিষ্ঠায় সরকারকে আন্তরিক উদ্যোহ নিতে হবে। পাটকলগুলোর প্রশাসনিক ব্যবস্থাপনার নিয়োজিত অতিরিক্ত জনবল কমিয়ে দিতে হবে। আধুনিক ব্যবস্থাপনা উপযোগী জনবল তৈরীতে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিতে হবে। বিদ্যমান পাটকলগুলোকে স্বতন্ত্র্য প্রতিষ্ঠান হিসেবে নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পরিচালনার ব্যবস্থা নিতে হবে।

৫। পাটকলগুলোর জন্য পাট ক্রয়ে অর্থসংস্থান গুরুত্বপূর্ণ। পাট মৌসুম শুরুর পূর্বেই প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান পাটকলগুলোকে দিতে হবে। এ জন্য বাজেটে থোকে বরাদ্দ রাখতে হবে।

৬। সরকারের কেন্দ্র থেকে তৃণমূল পর্যায় পর্যন্ত সকল সরকারি কার্যালয় ও সংস্থায় সরকারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাট ও পাটজাত পণের ব্যবহার বাধ্যতা মূলক করতে হবে। সরকার নিজে এক কাজ করে বেসরকারিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলোকেও এ কাজে সম্পৃক্ত করবে।

৭। সরকারের দক্ষতা উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় বর্তমানে পাটকলে কর্মরত শ্রমিকদের জন্য ব্যাপকভাবে 'আধুনিক মেশিন' পরিচালনার জন্য দক্ষতা উন্নয়ন ও পুনদক্ষায়নের জন্য প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিতে হবে। মেশিন পরিচালনার এই দক্ষতা অর্জনের কারণে কেউ কাজ হারাবে না।

৮। পাট পণ্য রপ্তানির মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে প্রণোদনা দিতে হবে। পাটপণ্য ব্যবহার সম্পর্কে জনগনের মধ্যে সচেতনতা বাড়তে হবে, জানতে হবে।

উপরোক্ত সুপারিশ ও প্রস্তাবনাসহ সঠিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে পাট ও পাটশিল্প তার হারানো গৌরব ফিরে পাবে। পাটের অর্থনীতি চাঙ্গা হলে দেশের অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। বাংলাদেশের ব্রান্ড পাট তার ঐতিহ্য ও সংকৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ করবে।